Rajshahi University journal of arts & law   Vol. 52 (2024)   pp. 17-36
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0709

যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

[The United Front and Awami League: A Historical Review]

মোসা. ছায়িদা আকতার*

Abstract

Despite establishment of Pakistan on the basis of religious unity in 1947, the political scenario began to change after the Language Movement of 1952. The Bengali nationalism rooted in language and liberal communal harmony started to replace religious and communal spirit in politics that resulted in the birth of East Pakistan Muslim Student League (later Student League), Awami Muslim League (later Awami League). As a result of the bad governance of Muslim League the people of East Pakistan gradually became rebellious and realized that to get their rights all democratic opposition parties would have to unite and work together. Under this circumstance all political parties came to one place for holding provincial election to measure their popularity. In May 1953 a special session of East Pakistan Awami Muslim League was held in Mymensigh. In this session decision was made to establish a united front which later was accepted in the historic council of Awami Muslim League on 14 November 1953. Mainly four opposition parties combined in the United Front namely Awami Muslim League of Maolana Bhasani and Suhrawardy, Krishak Praja Party of Fazlul Haque, Nezam-e-Islam of Maolana Atahur Ali and leftist Ganatantri Dal of Hazi Danesh. The United Front declared 21 points programme as their election manifesto. Their election symbol was "Boat". The booklet named "Jalem Sahir Soy Basar" published by United Front assembled the then political, social and financial situations. In spite of getting all government facilities for election campaign Muslim League failed miserably in the election and got only 9 seats among 237 Muslim seats. The United Front cabinet was formed on 3 April 1954 under the leadership of Fazlul Haque. Despite the biggest party of United Front, Awami Muslim League was not made a part of the cabinet at first. Later, they were made a part of it but Pakistan Government declined this cabinet in a non-democratic way and declared Governor's rule introducing section 92(A). Frequent interventions of central government were noticed in provincial politics of East Pakistan. The declaration of the Martial Law on 7 October 1958 ends the parliamentary system in Pakistan including the East Bengal.

Keywords: Language movement, Student League, 21-point programmes, Krishak Praja Party, Martial Law.

ভূমিকা:বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে আওয়ামী মুসলীম লীগের (পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ) নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনের ফলে জনগণের মধ্যে যে জাতীয় চেতনা পরিলক্ষিত হয় তারই প্রভাব পড়ে ১৯৫৪ সালের এই নির্বাচনে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, তাদের জাতীয়সত্তা পশ্চিম পাকিস্তানিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ আন্দোলন জনতা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে সহায়তা করে।[১] জনগণের মধ্যে এ সচেতনতার সৃষ্টি হয় যে,

---

* প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ;
ই-মেইল: sayeedaru@gmail.com

মুসলিম লীগের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে হলে সমগ্র বাঙালি জাতিকে একত্রিত হতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। ১৯৫৪ সালের এই নির্বাচন বাঙালিদেরকে একত্রিত করে। পূর্ববাংলার আওয়ামী মুসলীম লীগের ভেতরে ও বাইরে অবস্থানরত বামপন্থীদের উদ্যোগে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি বৃহত্তর নির্বাচনী জোট গঠনের মধ্যে দিয়ে জনগণের ঐক্যধর্মী মনোভাব সুপরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এ জোট গঠনের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির স্বার্থ বিরোধী মুসলিম লীগকে সমূলে ধ্বংস করা।[২] এছাড়া ভাষা আন্দোলনের পরিণতিতে মুসলিম লীগ একটি পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। জনগণের মধ্যে এ ধারণা জোরদার হতে থাকে যে, এই দলটি প্রদেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বশংবদে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে কিছু প্রভাবশালী নেতা ও মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। একজন প্রতাপশালী মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীকে (১৯০১-১৯৯২) তাঁর নিজের দলই অপাংক্তেয় ঘোষণা করে এবং দুর্নীতির কারণে তাঁকে 'প্রোডো' বলে রাজনৈতিক অঙ্গনে নিষিদ্ধ করা হয়।[৩] এমতাবস্থায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলার মানুষ জীবনের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চালানোর শপথ গ্রহণ করে এবং সরকারবিরোধী হয়ে ওঠে। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ ২৩৭টি মুসলিম আসনের মাত্র ৯টি আসন লাভ করে এবং এই বাংলায় মুসলিম লীগের রাজনৈতিক মৃত্যু হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের উপর অসংখ্য সাধারণ গ্রন্থ, গবেষণা গ্রন্থ, প্রবন্ধ লেখা হয়েছে কিন্তু এগুলোতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আওয়ামী লীগের ভূমিকা যথাযথভাবে উঠে আসেনি। যেমন, শ্যামলী ঘোষের *The Awami League 1947-1971,* M.B. Nair এর *Politics in Bangladesh: A Study of Awami League 1949-58*, Md. Abdul Wadud Bhuiyan এর *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, রওনক জাহান এর*Pakistan: Failure in National Integration,* Mohammad H.R. Takukdar সম্পাদিত *Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy*, আবু আল সাঈদের *আওয়ামী লীগের ইতিহাস ১৯৪৯-১৯৭১*, আবুল মনসুর আহমদের *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, অলি আহাদের *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫*, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার *পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর*, মিজানুর রহমান চৌধুরীর *রাজনীতির তিনকাল* প্রভৃতি মুক্তিসংগ্রামের উপর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বইগুলিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন, এতে সোহরাওয়ার্দী-মওলানা ভাসানী-ফজলুল হকের ভূমিকা, যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন, আওয়ামী লীগের সরকার গঠন, সরকারের কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে– এককভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিকাকে গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয় নি। এলক্ষ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ এ ঘোষিত Provincial Legislative Assembly Order 1947 অনুসারে ১৯৪৬ এর নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যে পরিণত হয়। সুতরাং পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১৯৫২ সালে। কিন্তু উক্ত পরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই যুক্তিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৬১(২) নং ধারা সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী টাঙ্গাইলের প্রভাবশালী জমিদার খুররম খান পন্নী (১৯২১-১৯৯৭)পরাজিত হওয়ায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার আর কোন নির্বাচন মোকাবেলা করতে ভয়

পায়।[৪] ফলশ্রুতিতে নূরুল আমিন সরকারের অনুরোধক্রমে পাকিস্তান গণপরিষদ The East Bengal Legislative Assembly (Continuation) Act, 1953পাস করার মাধ্যমে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের মেয়াদ আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করে। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ উক্ত নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়।[৫]

১৯৫২ সালের ভাষা সংগ্রাম গণসংগ্রামের রূপ ধারণ করে এবং এ সংগ্রামে সকল শ্রেণীপেশার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল। কিন্তুস্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে। সরকারি তৎপরতা ও দমননীতি এবং সাংগঠনিক শক্তির অভাবে আন্দোলনে সাময়িকভাবে ভাটা পড়ে। পরবর্তীতে ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলন একটু একটু করে ধীর গতিতে আবার শুরু হয়। ১৯৫৩ সালের শুরুতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালনের কথা ঘোষণা করে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক ঘোষণায় ছাত্রসমাজ ও আপামর জনসাধারণের কাছে ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি শহীদ স্মরণে রোজা রাখার আহবান জানায়। এই আহবানে সাড়া দিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মুসলিম ভক্তরা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে প্রার্থনা করে, ছাত্রাবাসগুলিতে ছাত্ররা অনেকেই সেদিন রোজা রাখে।[৬] ২১ ফেব্রুয়ারি ভোর থেকেই প্রভাত ফেরী করে ছাত্র-জনতা দলে দলে মিছিল নিয়ে আজিমপুর গোরস্থানে শহীদদের মাজারগুলিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানায়। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় উপস্থিত হয়। দুপুরের দিকে প্রায় ৩০ হাজারের বেশী ছাত্র-জনতার এক বিরাট মিছিল আরমানীটোলা ময়দানে সর্বদলীয় কর্মপরিষদের জনসভায় যোগ দেয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন আওয়ামী মুসলিম লীগের আতাউর রহমান খান (১৯০৭-১৯৯১) ও শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। আরমানীটোলার জনসভায় সভাপতিত্ব করেন আতাউর রহমান খান। এ সভায় বিদেশী কূটনৈতিক মিশন বিশেষ করে রাজধানী করাচি থেকে ফরাসী ও মার্কিন দূতাবাসের বিশেষ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সেদিন জনসভা ও মিছিলের প্রধান শ্লোগান ছিল 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক', 'জালেম লীগশাহী ধ্বংস হোক', 'গণপরিষদ ভেঙ্গে দাও', 'লীগ শাহীর দালাল মর্নিং নিউজ ধ্বংস হোক' ইত্যাদি।[৭]

ইতোমধ্যে প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ (ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদ নির্বাচনে ১৯৫২ সালে 'গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে।[৮] সলিমুল্লাহ হলে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে মুসলিম লীগ সমর্থিত প্যানেলকে পরাজিত করে। গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের পর থেকেই গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মহলে দেশের বৃহত্তমজনগোষ্ঠীকে স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণা জোগায়। এমতাবস্থায় ১৯৫৪ সালের প্রথমদিকে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দিলে বিরোধী রাজনৈতিক অঙ্গণে মেরুকরণ শুরু হয়ে যায়। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) তাঁর পুরনো দল কৃষক প্রজা পার্টিকে পুনর্গঠিত করে নতুন নামকরণ করেন 'কৃষক শ্রমিক পার্টি'। নির্বাচনের ঘোষণা ছাত্র সমাজকে যুক্তফ্রন্ট গঠনে তৎপর করে তোলে এবং ছাত্রদের তরফ থেকে সর্বপ্রথম দাবি উত্থাপিত হয়েছিল 'হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী এক হও'। অচিরেই এই দাবি জোরদার হতে থাকে। আওয়ামী মুসলিম লীগভুক্ত যুব সম্প্রদায়ও এই ব্যাপারে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩), আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখের যোগ্য নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। নির্বাচন উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগ যে সংগঠিত হচ্ছিল তা শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়। তিনি

বলেন, “মওলানা ভাসানী, আমি ও আমার সহকর্মীরা সময় নষ্ট না করে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। পূর্ববাংলার জেলায়, মহকুমায়, থানায় ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে এক নিঃস্বার্থ কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করতে সক্ষম হলাম। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্ররা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মনপ্রাণ দিয়ে রুখে দাড়াল”।[৯]

যুক্তফ্রন্টের পাশাপাশি কম্যুনিস্ট ব্লকও মুসলিম লীগ বিরোধী অবস্থান নেয়। তবে তা কখনও সীমিত পরিসরে, কখনো গোপনে, কখনো প্রকাশ্যভাবে। নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পরে নির্বাচনী নীতি নির্ধারণ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির এক বৈঠক হয়। সে বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে পার্টির প্রাদেশিক নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, লীগ সরকারের সাত বছরের কুশাসনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যেভাবে মুসলিম লীগের শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং ১৯৫২ সালের ভাষা সংগ্রামের ফলে সরকার যেভাবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সে পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সরকারবিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হলে নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করা সম্ভব।[১০] ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা তখন ছিল নিম্নমুখী। এমতাবস্থায় প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণাকে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের এবং ক্ষমতাসীন জনবিচ্ছিন্ন মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটানোর সুযোগ বলে বিবেচনা করে।[১১] ১৯৫৩ সালের মে মাসে ময়মনসিংহে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট গঠন করার উদ্যোগ নেয়া হয়[১২] এবং ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক কাউন্সিল অধিবেশনে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে শামসুল হকের পরিবর্তে শেখ মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক করা হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এগুলো হলো মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী মুসলিম লীগ, ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেজাম-এ-ইসলামী এবং হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।[১৩] যদিও যুক্তফ্রন্ট গঠন প্রসঙ্গে অলি আহাদ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রধান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, পাকিস্তান খেলাফতে রাব্বানী পার্টির সহযোগিতায় ‘যুক্তফ্রন্ট’ গঠন করেন।[১৪] ঐক্যবদ্ধভাবে আসন্ন নির্বাচনের মোকাবেলা করাই ছিল এই ফ্রন্ট গঠনের উদ্দেশ্য। ১৯৫৩ সালের ১৮ নভেম্বর আওয়ামী মুসলিম লীগের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় গণবিরোধী মূলনীতি প্রতিরোধ কমিটি। এই কমিটিতে আওয়ামী মুসলিম লীগ, খিলাফতে রাব্বানী পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি, কম্যুনিস্ট পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি দলও সংগঠনের প্রতিনিধি ছিল। এ কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। যুক্তফ্রন্ট গঠনের ক্ষেত্রে এই সর্বদলীয় মূলনীতি প্রতিরোধ কমিটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মুসলিম লীগ চক্রকে মোকাবেলার কৌশলগত কারণে কম্যুনিস্ট পার্টিকে ফ্রন্টে নেয়া হয়নি। তবে যে অঞ্চলে শক্তিশালী কম্যুনিস্ট নেতারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, ঐ সকল অঞ্চলে যুক্তফ্রন্ট কোন প্রার্থী দেয়নি। যুক্তফ্রন্ট গঠন সম্পর্কে মওদুদ আহমদ (১৯৪০-২০২১) বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগের ভেতরে ও বাইরে অবস্থানরত একটি বৃহত্তর নির্বাচনী জোট গঠনের মধ্যদিয়ে জনগণের ঐক্যধর্মী মনোভাব সুপরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এই জোট গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইতোমধ্যে জাতীয়তাবাদী শক্তি কর্তৃক বাঙালিবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত মুসলিম লীগকে সমূলে ধ্বংস করা। আওয়ামী মুসলিম লীগের

সমর্থকদের মাধ্যমে সংগঠিত কম্যুনিস্ট কর্মী এবং যুবদলের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালে গঠিত প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল ‘গণতন্ত্রী দল’ ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এই নির্বাচনী জোট গঠন করার লক্ষ্যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর উপর অপরিমেয় চাপ সৃষ্টি করে। এভাবে বাংলার রাজনৈতিক নেতা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ‘যুক্তফ্রন্ট’ নামে সংগঠিত এই নির্বাচনী জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে সুবিখ্যাত ২১-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।[১৫] যুক্তফ্রন্ট গঠন সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন:

> জনতা একদিনের জন্যও লীগ সরকারকে বরদাস্ত করতে রাজি ছিল না। তাই তারা সমস্ত লীগবিরোধী দলগুলোর সমন্বয়ে মুসলিম লীগকে পূর্ববাংলার মাটি হতে উৎখাত করার জন্য একটি ‘যুক্তফ্রন্ট’ গঠন করার আওয়াজ তুলে। এই দাবির প্রেক্ষিতে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর মোমেন শাহীর ঐতিহাসিক কাউন্সিল অধিবেশনে লীগ বিরোধী ‘যুক্তফ্রন্ট’ গঠন করে নির্বাচনে মুসলিম লীগ জুলুম শাহীর মোকাবেলা করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১৬]

উল্লেখ্য যে, যুক্তফ্রন্টভুক্ত দল সম্পর্কে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও এটা স্পষ্ট যে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে গঠিত ছিল। তবে আওয়ামী মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে যুক্তফ্রন্ট গঠন করার বিষয়ে ভিন্নমতও ছিল। উদাহরণ হিসেবে অলি আহাদের বক্তব্য তুলে ধরা যায়। তিনি বলেন,

> আমি যুক্তফ্রন্ট গঠন করিবার বিরুদ্ধে আমার দৃঢ়মত পোষণ করি। আমার মত ছিল যে, চরিত্রহীন, অলস, লুটপাট সমিতির সদস্য ও দুর্নীতিবাজরা যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন লাভের জন্য সর্ব কলা-কৌশল প্রয়োগ করিবে এবং সৎ, চরিত্রবান, গণতন্ত্রমনা দেশপ্রেমিক বন্ধুরা আইনসভার মারফত দেশ সেবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে।[১৭]

শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট গঠনের পক্ষে ছিলেন না বলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনিও ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কেন যুক্তফ্রন্ট বা সকল বিরোধী দলের রাজনৈতিক জোটকরতে চান না।

> ... কারণ, যাদের সাথে নীতির মিল নাই, তাদের সাথে মিলে সাময়িকভাবে কোন ফল পাওয়া যেতে পারে, তবে ভবিষ্যতে ঐক্য থাকতে পারে না। তাতে দেশের উপকার হওয়ার চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে।[১৮]

শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিম লীগ বিরোধী সব রাজনৈতিক দলের ঐক্যের প্রয়োজন আছে ঠিকই কিন্তু আদর্শিকভাবে যাদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে তিনি তাদের সাথে ঐক্যের বিষয়ে একমত হন। তিনি যেকোন ভাবে ক্ষমতায় যাওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। মওলানা ভাসানীও শেখ মুজিবসহ অনেকের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, আওয়ামী লীগ সদস্যদের মধ্যে যেন যুক্তফ্রন্ট সদস্যরা মাথা তুলতে না পারে এ বিষয়ে মওলানা ভাসানী তাকে সজাগ থাকতে বলেছেন।[১৯]

মওলানা ভাসানীও অনাদর্শিক লোকেদের সাথে ঐক্যের বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। তবে ভাসানী শেখ মুজিবের কাছে এবিষয়টি স্পষ্ট করেন যে, যদি হক সাহেব (এ কে ফজলুল হক) আওয়ামী লীগে আসেন তাকে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং উপযুক্ত স্থান দেওয়া যেতে পারে।[২০] ফজলুল হকের সাথে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতানৈক্য তৈরী হওয়ায় ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করেন। মুসলিম লীগ ত্যাগ করার পর এক খোলা চিঠিতে তিনি জিন্নাহকে লেখেন,

> আমি মুসলিম লীগ ত্যাগ করার সময় নির্ভুলভাবে বুঝতে পেরেছি যে, একজন লোকের (মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ) ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভ এবং বাংলার তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ লোকের উপর তাঁর ক্ষমতার ব্যাপ্তির জন্যে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনকে আজ পদদলিত করা হয়েছে।[২১]

কামরুদ্দীন আহমদ এই বক্তব্যের সাথে একমত হয়েও মনে করেন যে, উপরোক্ত কারণেই শুধুমাত্র ফজলুল হক মুসলিম লীগ ছেড়েছিলেন তা বলা যায় না। কারণ ইতোপূর্বেই পদোন্নতি না হওয়ায় ১৯১২ সালে সরকারি চাকরি থেকে তিনি ইস্তফা দেন, ১৯২৪ সাথে স্বরাজ পার্টি ত্যাগ করে মন্ত্রীত্ব এবং নিজের হাতে গড়া কৃষক প্রজা পার্টির অন্যান্য নেতৃত্বের সাথে দূরত্ব তৈরী হওয়ায় তিনি এটিও ত্যাগ করেন। কাজেই ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগ ত্যাগও এরই ধারাবাহিকতা। তিনি তার বিরোধী মতামতকে সহ্য করতে পারতেন না।[২২] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সময়কালে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবারও তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচন করে তিনি পরাজিত হলে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদানের জন্য মনস্থির করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের দু'একটি জনসভায় তিনি যোগও দেন। কিন্তু বামপন্থীদের যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পুনরায় কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠন করেন। অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলগুলোর সাথে আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক জোট গঠন ছিল একটি কৌশলগত পদক্ষেপ। এছাড়া ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর একটি নির্বাচনী ঐক্যজোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, মওলানা ভাসানী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ, ভাসানী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি দলকে সংগঠিত করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন এবং সোহরাওয়ার্দী প্রাদেশিক রাজনীতির চেয়ে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিতেই অধিক আগ্রহী ছিলেন।[২৩]

১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে,২১ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অমুসলমানের জন্য আসন সংরক্ষণপূর্বক পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুসারে এ নির্বাচন হবে। পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। এর মধ্যে ২৩৭টি আসন (৯টি মহিলা আসনসহ) মুসলমানদের জন্য এবং ৭২টি (৩টি মহিলা আসনসহ) অমুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ৭২ আসনের মধ্যে সাধারণ আসন (বর্ণ হিন্দুসহ) ৩১টি এবং তফসিলী জাতি হিন্দু ৩৮টি, বৌদ্ধ ২টি এবং খ্রিস্টান আসন ১টি সংরক্ষিত ছিল।[২৪] নির্বাচনে বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করলেও ভোট যুদ্ধ হয় প্রধানত যুক্তফ্রন্ট এবং মুসলিম লীগের মধ্যে।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী মেনিফেস্টো হিসেবে যে ২১-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে তা জনগণকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। এই ২১-দফার প্রণেতা ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)। যুক্তফ্রন্টের মতে ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। তাই ২১ সংখ্যাটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ইতঃপূর্বে আবুল মনসুর আহমদ আওয়ামী মুসলিম লীগের ৪২ দফার যে নির্বাচনী ইশতেহার রচনা করেছিলেন, পরবর্তীতে এটাকেই ২১-দফাতে পরিণত করা হয়।[২৫] হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই ২১-দফা খসড়া পরীক্ষা করে অনুমোদন দেন। কৃষক শ্রমিক পার্টির এ. কে. ফজলুল হক ও আওয়ামী মুসলিম লীগের মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঐতিহাসিক ২১-দফা স্বাক্ষর করেন এবং তাদের যুক্ত ঘোষণা ৫ ডিসেম্বরের *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২৬] একুশ দফা কর্মসূচিতে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, রাজবন্দিদের মুক্তিদান, ২১ ফেব্রুয়ারিকে ছুটির দিন ঘোষণা, পাটশিল্প জাতীয়করণ, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৭] ২১-দফা কর্মসূচির মধ্যে ১৯ নং

দফাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র দপ্তর ও মুদ্রাব্যবস্থা এ তিনটি বিষয় কেন্দ্রের হাতে রেখে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বশাসিত ও সার্বভৌম করার কথা বলা হয়। ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলার রাজনীতি সচেতন মানুষ যে স্বপ্ন দেখে এসেছে সেগুলোকে এই নির্বাচনী ইশতেহারে মূর্ত করে তোলা হয়। এই ২১-দফা কর্মসূচি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলো ছিল বিগত ৭ বছরে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের চরম অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে, বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম সম্মিলিত ব্যালট যুদ্ধ ছিল এই নির্বাচন। স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকারের উপর জনসাধারণ এতোই ক্ষিপ্ত ছিল যে, নির্বাচনী অভিযান শুরু হওয়া মাত্র যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এক ব্যাপক গণজাগরণ সূচিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষ যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে এগিয়ে আসে। আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ নেতারা সারা বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ২১-দফার প্রশ্নে জনগণকে সচেতন করে তোলে। ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানী প্রচার উপলক্ষে মফস্বলেই থাকতেন এবং পূর্ববাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবির পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেন। ছাত্রলীগ ও ছাত্রফ্রন্টের নেতারাও যুক্তফ্রন্টের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কাজ করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালের এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী অভিযানে সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। যুক্তফ্রন্টের হেড অফিস ছিল পুরনো ঢাকার সদরঘাট এলাকায় ৫৬ সিমসন রোড এবং অফিস সেক্রেটারী ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৮২)।[২৮] উল্লেখ্য যে, ২১-দফা রচিত হওয়ার পর মওলানা ভাসানী দাবি করেন যে, কোরান ও সুন্নাহর বরখেলাপে কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না- এই মর্মে একটা দফা থাকা উচিত। কিন্তু যেহেতু ২১-দফা কম বা বেশী করার সুযোগ ছিল না তাই ঘোষণাপত্রের সূচনায় নীতি হিসেবে লেখা হয়: ‘কোরান ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাপ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।[২৯]

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য, বিশেষ করে চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অফিস আদালতে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়োগের তুলনামূলক চিত্রটি তুলে ধরলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।[৩০]

বিভাগ	**পশ্চিম পাকিস্তান**	**পূর্ববাংলা**
কেন্দ্রীয় সচিবালয়	৬৯২ জন	৪২ জন
পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	১৩২ জন	০৩ জন
রেডিও পাকিস্তান	৯৮ জন	১৪ জন
সরবরাহ ও উন্নয়ন বিভাগ	১৬৪ জন	১৫ জন
রেলওয়ে বিভাগ	১৬৮ জন	১৪ জন
ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ	২৭৯ জন	৫০ জন
কৃষি উন্নয়ন বিভাগ	৩৮ জন	১০ জন
জরিপ বিভাগ	৫৪ জন	২ জন
পাকিস্তান বিমান বাহিনী	১০২৫ জন	৭৫ জন

১৯৫৪ সালের ৪ মার্চ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অফিস থেকে 'জালেম শাহীর ছয় বৎসর' শিরোনামে একপ্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয় যেখানে সে আমলের বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করা যায়। পুস্তিকার অসংখ্য কপি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিতরণ করা হয়। পুস্তক প্রণয়নের সাথে জড়িতদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৩১] 'জালেম শাহীর ছয় বৎসর' থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তা তুলে ধরা হলো:[৩২]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ববাংলা
বিশ্ববিদ্যালয়	৪	২
মেডিকেল কলেজ	৫	১
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৫	১
টেকস্টাইল কলেজ	৮	০
ফরেস্টারী কলেজ	২	০
কলেজ	৭৬	৫৬
নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫২৪৬	২২১৭

এছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানের মাতৃসদন হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ১১৮টি, সেখানে পূর্ববাংলায় মাত্র ২২টি ছিল। কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৮৫০০ জন অথচ পূর্ববাংলায় ছিল ৩৩৯৩ জন।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রতীক ছিল 'হারিকেন'। নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলা রাষ্ট্রভাষা করা, পূর্ববাংলায় নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। ইশতেহারে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কোরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার, পাকিস্তানী আদর্শ মোতাবেক মৌলিক অধিকার দেওয়ার, মসজিদকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় শিক্ষা দান, কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং ইসলামি সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এছাড়াও ইশতেহারে ব্যক্তি স্বাধীনতা. মোহাজের, সংখ্যালঘু, বেকার, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও পাট সমস্যার সমাধানেরও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[৩৩] এই নির্বাচনে জয়লাভের জন্য মুসলিম লীগ সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় পাকিস্তানের সংহতি, ধর্মীয় শ্লোগান এবং ভারত বিরোধিতা প্রাধান্য পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় মুসলিম লীগ যে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছিল আবুল মনসুর আহমদের লেখায় তা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, "কায়েদে আযমের ভগিনী মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহ, মওলানা এহতেশামুল হক থানবীর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় আলেম পাকিস্তানের সংহতি এবং ইসলামের নামে প্রচারে বাহির হইয়াছেন।"[৩৪] মুসলিম লীগ সরকার পুলিশ প্রশাসন, সরকারি যানবাহন, রেডিও প্রভৃতি অবাধে ব্যবহার করে। এমনকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (১৯০৫-১৯৮০) ঢাকায় দু'সপ্তাহের বেশি সময় অবস্থান করে মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণা চালায়। শুধু তাই নয়, প্রতিটি আসনের যুক্তফ্রন্টের অসংখ্য কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।[৩৫] কিন্তু হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী-মুজিবের যোগ্য নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের কর্মীবাহিনীর আত্মত্যাগ, দৃঢ়তা, ব্যাপক গণসংযোগ, নেতৃত্বের সততা এবং জনগণের প্রতি সত্যিকার আন্তরিকতার কারণে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল সেই মুসলিম লীগ ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে অভাবিত

পরাজয় বরণ করে। নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২১৫টি আসন এবং মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে। খেলাফতে রব্বানী পার্টি ১টি আসন, স্বতন্ত্র ১২টি আসন পায়।[৩৬] উল্লেখ্য যে, নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালীন সময়ে যশোরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেছিলেন, 'নয়টি কী বড় জোর দশটি আসন পেতে পারে মুসলিম লীগ'।[৩৭] তাঁর এ কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়। স্বতন্ত্র সদস্যদের ৮ জন যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন, ফলে যুক্তফ্রন্টে সদস্য সংখ্যা ২২৩-এ উন্নীত হয়। চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত একজন স্বতন্ত্র সদস্য পরে মুসলিম লীগে যোগদান করলে ঐ দলের সদস্য সংখ্যা হয় ১০ জন। হিন্দু আসন ছিল ৭২টি। আবার দলগতভাবে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৩টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি ৪৮টি, নেজাম-এ-ইসলামী ১৯টি এবং গণতন্ত্রী দল ১৩টি আসন লাভ করে। উল্লেখ্য যে, এই নির্বাচনে মুসলমান মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনে ৩৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এই আসনের সবকটিতেই যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা বিজয়ী হন। কৌশলগত কারণে কম্যুনিস্টরা তাদের দলীয় প্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ১৫টি আসনে জয়লাভ করেন। নির্বাচিত উল্লেখযোগ্য কম্যুনিস্ট ব্যক্তিগণ হলেন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মো. আতাউর রহমান, মো. আব্দুল মতিন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, দেওয়ান মাহবুব আলী, সরদার ফজলুল করিম এবং মোহাম্মদ তোয়াহা।[৩৮] এ নির্বাচনে ফজলুল হক দুটি আসনে জয়লাভ করেন। মুসলিম লীগের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন আওয়ামী মুসলিম লীগের তরুণ প্রার্থী খালেক নেওয়াজের কাছে পরাজিত হন। গোপালগঞ্জের আসনে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে প্রায় ১০ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। এ বিষয়ে শেখ মুজিব লিখেছেন "জনসাধারণ আমাদের শুধু ভোটই দেয় নাই, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা নজরানা হিসেবে দিয়েছিল নির্বাচনে খরচ চালানোর জন্য।"[৩৯] অথচ এই নির্বাচনে শেখ মুজিবকে পরাজিত করার জন্য জনাব ওয়াহিদুজ্জামান সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেন। এ বিষয়ে শেখ মুজিব লিখেছেন "মওলানা সাহেব[৪০] ইউনিয়নের পর ইউনিয়নে স্পিডবোট নিয়ে ঘুরতে শুরু করলেন এবং এক ধর্মসভা ডেকে ফতোয়া দিলেন আমার বিরুদ্ধে যে, 'আমাকে ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, ধর্ম শেষ হয়ে যাবে।' সাথে শর্ষিনার পীরসাহেব, বরগুনার পীরসাহেব, শিবপুরের পীরসাহেব, রহমতপুরের শাহ সাহেব সকলেই আমার বিরুদ্ধে নেমে পরলেন এবং যতরকম ফতোয়া দেয়া যায় তা দিতে কৃপণতা করলেন না। দুই-চারজন ছাড়া প্রায় সকল মওলানা, মৌলভীসাহেবরা, পীরসাহেবদের সমর্থকরা টাকার লোভে রাতের আরাম ও দিনের বিশ্রাম ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমাকে পরাজিত করার জন্য।"[৪১] মুসলিম লীগের চারজন মন্ত্রী ও পঞ্চাশ জন নেতার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯৫৪ সালের এ নির্বাচনে পূর্ববাংলা থেকে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে এর রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে। যুক্তফ্রন্টের এ বিজয়কে দেশে বিদেশে 'ব্যালট বাক্সে বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৪২] এ রায় ছিল পূর্ববাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষে গণভোট বিশেষ। এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার জাতীয় এলিট গোষ্ঠীর আধিপত্য নিঃশেষিত হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতি তখনও ভূস্বামী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। এই নির্বাচনের ফলে পূর্ববাংলায় জমিদারদের স্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠী, যেমন আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। নির্বাচিতদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যই ছিলেন নতুন, বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং এদের অনেকেরই পূর্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত ২২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৪০ জনই ছিলেন আওয়ামী লীগের।[৪৩]

পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্টের এই বিজয়ের মূল স্থপতি ছিলেন এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তারা তাদের প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে বিপুলভাবে জাগিয়ে তোলেন। কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর *A Socio Political History of Bengal and The Birth of Bangladesh*গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে যুক্তফ্রন্টের জয়ের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন:[৪৪]

> **এক.** নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় জনগণ মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ লাভ করে। সাধারণ জনগণের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রতি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সমর্থন ছিল না। স্থানীয় পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের অনেকে মুসলিম লীগের সমর্থন করলেও এরা ছিলেন কায়েমী স্বার্থের প্রতিভু।
>
> **দুই.** জনগণ পাঞ্জাবিদের নিয়ন্ত্রণাধীন আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।
>
> **তিন.**লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাংলার 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের' দাবি পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়।
>
> **চার.** উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মুসলিম লীগ ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মুসলিম লীগের এই মনোভাব সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সচেতন বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ জাগিয়ে তোলে।
>
> **পাঁচ.** পুলিশি গুলিবর্ষণ, নির্বাচন বানচাল করার জন্য সরকারের ষড়যন্ত্র, নিরাপত্তা আইনে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ইত্যাদি কারণে জনগণ মুসলিম লীগের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যুক্তফ্রন্টে ভোট দেন।
>
> **ছয়.** লবণ, কেরোসিন তেল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় গৃহিনীরাও সাধারণভাবে মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। এটাও মুসলিম লীগের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে।

নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয় বরন করে মুসলিম লীগ দল ও সরকার নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। স্বয়ং মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন সাংবাদিকদের বলেন, পূর্ববঙ্গের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি।[৪৫] পাকিস্তান মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক জনাব গিয়াসউদ্দিন পাঠান ৯ মার্চ (১৯৫৪) পূর্ববঙ্গের গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে মুসলিম লীগের অভিযোগ জানান। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক মঈনউদ্দীন আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন:

> লীগ মনোনীত প্রার্থী ও তাঁহাদের এজেন্টদের নিকট হইতে লীগ অফিসে এই মর্মে বহু লিখিত অভিযোগ আসিতেছে যে, অনেক প্রিসাইডিং অফিসার ও অনেক পোলিং অফিসার প্রকাশ্যে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষ অবলম্বন করিতেছেন। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বহু যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। তাহারা নিজেদের দলের জন্য ক্যানভাস করে। অধিকুন্তু কয়েকজন মোছলেম লীগ ভোটারকেও টানাহেঁচড়া করেন।[৪৬]

আজাদ পত্রিকার ৯ মার্চের সংখ্যায় 'নির্বাচন সুষ্ঠু' হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছিল, অথচ মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় বুঝতে পেরে ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই ঐ পত্রিকার ১১ মার্চ সংখ্যায় 'তদন্ত ও প্রতিকার' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় লেখা হয়। তাতে বলা হয়, 'যেসব ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সুমহান দায়িত্ব পালন করেন নাই কিংবা ইচ্ছা করিয়া অন্যায় এবং পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।'[৪৭]

মুসলিম লীগের মুখপাত্র *দৈনিক আজাদের* মতে, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে উর্দুর পক্ষে মুসলিম লীগের অবস্থান, পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি একগুয়ে বিরোধিতা, পূর্ববাংলার জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতি, সাধারণ জনগণ থেকে নেতৃবৃন্দের বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের পরাজয়ের প্রধান কারণ।[৪৮] তাছাড়া এই দল যথাযথভাবে সংগঠিত ছিল না এবং ঐ সময় দলের কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি ছিল না।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ভীতির কারণ হবে বলে *ডন* পত্রিকার মন্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে সোহরাওয়ার্দী দ্ব্যর্থহীনভাবে ইতঃপূর্বে ঘোষণা করেছিলেন, 'The U.F. leaders would fight to the last to maintain the integrity of Pakistan and its independence. He refuted the bootless accusation that if the U.F. won it would strike at the root of Pakistan.'[৪৯] নির্বাচনে জয়লাভের পর সোহরাওয়ার্দী করাচি পৌঁছলে বিভিন্ন শ্রেণির লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানান। জনগণ নিজ নিজ দলকে উপেক্ষা করে ''Long live Suhrawardy'', ''Long live Fazlul Haq'', ''Long live the U.F.'', ''Down with dictatorship'', ''Down with Imperialism'' এবং ''Dissolve constitutent Assembly'' লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করে। সোহরাওয়ার্দীকে নায়কোচিত সংবর্ধনা দেওয়া হয় যা ইতঃপূর্বে করাচিতে দেখা যায়নি।[৫০] এ জয় আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালির আত্মজাগরণের জয় এবং মুক্তি অর্জনের পথে আরও একধাপ অগ্রসর হওয়া।

নির্বাচনে জয়লাভের পরে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা গঠনে জটিলতার আভাস লক্ষ্য করা যায়। যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হবার পরপরই খবর রটে যায় যে, পরাজিত মুসলিম লীগ বিভিন্ন মাধ্যমে ফজলুল হকের সাথে যোগাযোগ করছে। কৃষক শ্রমিক পার্টির বেশ কিছু সদস্য আগে মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, তারা ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাছিলে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং যেকোন প্রকারে তারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে অভ্যস্ত। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন:

> নির্বাচনে জয়লাভ করার সাথে সাথে আমাদের কানে আসতে লাগলো জনাব মোহাম্মদ আলী বগুড়া হক সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করছেন, পুরানা মুসলিম লীগারদের মারফতে- যারা কিছুদিন পূর্বে হক সাহেবের দলে যোগদান করে এমএলএ হয়েছেন কৃষক শ্রমিক দলের নামে। আদতে তারা মনেপ্রাণে মুসলিম লীগ।[৫১]

মন্ত্রীসভা গঠনের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল আওয়ামী মুসলিম লীগের একটি সভা হয় এবং সভায় নীতিগতভাবে সবাই একমত হন যে, ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের নেতা হবেন। কিন্তু কোন দল থেকে কতজন মন্ত্রী হবেন বিশেষকরে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়ায় আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে কতজন মন্ত্রী নেওয়া হবে সে বিষয়টি সুরাহা হওয়া উচিত বলে সবাই মনে করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর উচিত হবে ফলজুল হক নেতা নির্বাচিত হওয়ার আগেই মন্ত্রিত্বের বিষয়টি ঠিক করা। সভায় রংপুরের আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা খয়রাত হোসেন প্রস্তাব করেন, "জনাব এ.কে. ফজলুল হক সাহেবকে নেতা নির্বাচন করার পূর্বে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব তাঁর সাথে পরামর্শ করে মন্ত্রীদের লিস্ট ফয়সালা করা উচিত। একবার তাঁকে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী দলের নেতা করলে তাঁর দলবলের মধ্যে এমন সমস্ত পাকা খেলোয়ার আছে, যারা চক্রান্তের খেলা শুরু করতে পারে। আর একজন ডেপুটি লিডার আমাদের দল থেকে করা উচিত, কারণ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যুক্তফ্রন্টের মধ্যে।"[৫২]

শুধু খয়রাত হোসেন নয় সমসাময়িক রাজনীতিবিদ যারা যুক্তফ্রন্টের সাথে কাজ করেছেন তারা সবাই প্রায় একই কথা বলেন। সবার বক্তব্যের মূল কথা ছিল ফজলুল হকের উপরে আস্থা রাখা যায় না। তিনি অন্যের কথা সিদ্ধান্ত নেন। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের তরুণদের আশংকায় সত্য হয়। যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় শরিকদল আওয়ামী মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে যুক্তফ্রন্ট এমএলএ-দের যে সভা হয়, তাতে ফজলুল হককে পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত করা হয়।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী সাফল্য মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী সুনজরে দেখেনি। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর এবং ফজলুল হককে দলীয় নেতা নির্বাচনের পূর্বেই ১৯৫৪ সালের ২৫ মার্চ পূর্ববাংলার তদানিন্তন গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩) ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানান। ৩ এপ্রিল ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন গঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যরা হলেন– আবু হোসেন সরকার (বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার), আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (বেসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগ) এবং সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া (শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প)।[৫৩]

এই মন্ত্রিসভায় যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় শরিক দল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী আওয়ামী মুসলিম লীগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, ফলে আওয়ামী লীগের সাথে ফজলুল হকের মতানৈক্য ঘটে। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারসহ মুসলিম লীগের নেতারা যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভাকে সুনজরে না দেখে, বরং তা ভাঙনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইতোমধ্যে ফজলুল হকের কলকাতা ভ্রমণকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, ৩০ এপ্রিল ফজলুল হক কলকাতা যান এবং বিভিন্ন সংবর্ধনা সভায় যে ভাষণ দেন তার মূল বক্তব্য ছিল, 'রাজনৈতিক কারণে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে থাকলেও বাঙালির শিক্ষা সংস্কৃতি এবং বাঙালিত্বের যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে তা দুটি বাংলায়ই বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।'[৫৪] অথচ ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্ত না করার জন্য তিনি কোন বিবৃতি দেননি, এমনকি বাংলা বিভক্তির বিরুদ্ধে সকল মুসলমান পরিষদ সদস্য যখন ভোট দেন, তিনি তখন ভোট দেননি। ফলে তার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। এমতাবস্থায় ফজলুল হক তার সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীগকে অন্তর্ভুক্ত করান। কেএসপি থেকে আরও ৩ জন এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৭ জন সদস্য নিয়ে ১৫ মে মোট ১৪ জন সদস্য বিশিষ্ট সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়।[৫৫] শপথ গ্রহণের অববহিত পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান বেতারের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, '২১-দফা কর্মসূচী সফল করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তবে ... আল্লাহর নিকট প্রার্থনা তিনি যেন ২১-দফা বাস্তাবায়নে আমাদের সাহায্য করেন।[৫৬] উল্লেখ্য যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লীউন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। ফজলুল হক প্রথমে শেখ মুজিবকে মন্ত্রীসভায় নিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তবে শপথানুষ্ঠান শেষে তিনি শেখ মুজিবকে পৌত্র বলে সম্বোধন করেন।[৫৭] কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ মন্ত্রীসভার পতনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাছাড়া *নিউইয়র্ক টাইমস্*-এর সংবাদদাতা জন পি কালাহানের সাথে ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে[৫৮] মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে সরকার তাকে দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে। ১৯৫৪ সালের ১৫ মে যেদিন যুক্তফ্রন্টের সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা শপথ নেয় সেদিনই আদমজীতে শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া হয়। দাঙ্গায় অসংখ্য লোক মারা যায়। শেখ মুজিব তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি একটা একটা করে গণনা করে মৃত লাশের হিসাব করেন– তাতে পাঁচশতের উপর লাশ স্বচক্ষে দেখতে পান এবং শ'খানেক লাশ পুকুরের মধ্যে ছিল বলে তিনি ধারনা করেন।[৫৯] এ দাঙ্গা সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, 'এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন দাঙ্গায়ও দেখি নাই। পরবর্তী কয়েক রাত আমি ঘুমাইতে পারি নাই।'[৬০]এই দাঙ্গার সময় আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা শেখ মুজিব ও মোহন মিয়া আহতদের হাসপাতালে পাঠান এবং উত্তেজিত উভয়পক্ষের জনতার সাথে কথা বলে তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করেন।[৬১] এ প্রসঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন যে, 'হক সাহেবের নেতৃত্বে মন্ত্রী হিসেবে তিনিও ঘটনাস্থলে গিয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে শান্তি স্থাপনের

চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত উত্তেজিত জনতা কিছুটা শান্ত হয়'।[৬২] পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে এ বিষয়টিকেও কাজে লাগান এবং আদমজীর দাঙ্গার দায় প্রাদেশিক সরকারের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ মে (১৯৫৪) পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে প্রদেশের উপর ৯২(ক)[৬৩] ধারা প্রবর্তন করে গভর্নরের শাসন জারি করা হয়[৬৪] এবং ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত তা চলে। আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫জন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ সদস্য এবং শত শত রাজনৈতিক নেতা কর্মী ও সংগঠককে গ্রেফতার করা হয়।[৬৫] গ্রেফতারের পূর্বে ৩০ মে করাচি থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেই অপরাহ্নে শেখ মুজিবুর রহমান তার বাসভবনে আবদুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালাল উদ্দীন ও অলি আহাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৬৬] আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপাত্র *দৈনিক ইত্তেফাকের* উপর কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ফজলুল হককে গৃহাভ্যন্তরে অন্তরীণ করা হয়।[৬৭] গভর্নরের শাসন জারির সময় আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা মওলানা ভাসানী বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য বার্লিন গিয়েছিলেন। পূর্ববাংলার গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা সদর্পে ঘোষণা করেন যে, মওলানা ভাসানীর মত রাষ্ট্রদ্রোহী প্রত্যাবর্তন করলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে।[৬৮] সোহরাওয়ার্দী বিদেশে অবস্থান করায় প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ববাংলায় কোন প্রতিবাদ কিংবা মিটিং-মিছিল হয়নি। পূর্ববাংলার পরবর্তী রাজনীতিতে ঘন ঘন কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ঘটতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানের রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। কারণ ব্যক্তিত্বশালী ও গণতন্ত্রমনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে (১৮৮৯-১৯৬৪) দিয়ে দাসানুদাসের মতো কাজ করানো সম্ভব ছিল না। সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের যোগসাজসে এ দেশের রাজনীতিতে বিশেষ করে পূর্ববাংলার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নির্লজ্জের মতো হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তানের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথ কূটনৈতিক শালীনতা বিসর্জন দিয়ে পূর্ববাংলার এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ শতকরা ৮০টি আসন জয়ের ভবিষ্যতবাণী করেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট অবিশ্বাস্য ফল লাভ করে জনগণের রায় নিয়ে এগিয়ে গেলে তিনি আবার বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রদ-বদল হইবে না বা কেন্দ্রীয় সরকার প্রভাবিত হইবে না।[৬৯] এ সময়ের জঘন্যতম ঘটনা ছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথের কন্যার সাথে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার ছেলের বিবাহের বিষয়টি। এমনকি পূর্ববাংলার প্রবল প্রতিবাদের মুখে ৯২(ক) ধারা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় পাকিস্তান সরকার প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা ও বাগদাদ চুক্তি সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করে। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে জাতীয় পরিষদে সরদার বাহাদুর খান (আইউব খানের ছোটভাই) এক চাঞ্চল্যকর তথ্য দেন যে, মার্কিন সরকারই সাবেক প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে দেশে সামরিক আইন জারি করতে বাধ্য করেছিল[৭০] অথচ ইস্কান্দার মীর্জার পদচ্যুতির সময় মার্কিন সরকার নীরব দর্শক ছিল।

সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিলের পর পাকিস্তানের শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি আরও বিস্তৃত হয়। ফজলুল হক রাজনীতি থেকে অবসর ঘোষণা করেন। ১৪ নভেম্বর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ঢাকায় এলে বিমান বন্দরে ফজলুল হক ও আওয়ামী মুসলিম লীগের আতাউর রহমান খান তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। পূর্ববাংলায় পার্লামেন্টারি সরকার

প্রতিষ্ঠার আশায় আওয়ামী মুসলিম লীগ গভর্নরকে স্বাগত জানালেও তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। গভর্নর জেনারেল ঢাকা আসার আগেই কাগজে বিবৃতি দেন যে, ফজলুল হককে তিনি আর দুশমন বলে মনে করেন না। এটা ছিল গোলাম মোহাম্মদের একটা চাল। ১৯৫৪ সালের ১১ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দী করাচী ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে শোনা যায় যে, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করে গভর্নর গোলাম মোহাম্মদ মন্ত্রীসভা পুনর্গঠন করবেন। এ ব্যাপারে আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যেও অনেক আলোচনা হয়, অনেকে সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভায় যোগদানের বিরোধীতা করেন। এ ব্যাপারে গভর্নরের সাথে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আলোচনা হয়। গভর্নর তাকে জানান যে শুরুতেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করায় অসুবিধা আছে। প্রথমে তাঁকে সাধারণ মন্ত্রী হিসেবেই মোহাম্মদ আলী কেবিনেটে ঢুকতে হবে। অল্পদিন পরেই সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত করা হবে। মন্ত্রীসভায় ঢুকামাত্র তাঁর উপর শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেওয়া হবে। আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আরও দুইজন মন্ত্রী নেওয়া হবে, শাসনতন্ত্র অনুসারে এক বছরের মধ্যে দেশে সাধারণ নির্বাচন হবে, নির্বাচিত পার্লামেন্টের শাসনতন্ত্রের সংশোধনের পূর্ণ অধিকার থাকবে ইত্যাদি আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে আলোচনা করে ২০ ডিসেম্বর তিনি আইনমন্ত্রী পদে যোগ দেন। কিন্তু গভর্নর তার কথা রাখেননি।[৭১] কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। ফলে যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বিরোধ আরো বেড়ে যায়।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী হয়েই কেন্দ্রীয় এক ইউনিট প্রথা,[৭২] সংখ্যাসাম্য নীতি[৭৩] এবং সংবিধান কনভেনশনের কথা ঘোষণা করে। ফলে পূর্ববাংলা তথা আওয়ামী লীগেও এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি ওঠে। যাহোক, বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানেরমারীতে দ্বিতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে এই সংখ্যাসাম্যের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ৩ জুন (১৯৫৫) পূর্ববাংলা থেকে ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহার করা হয়। ৬ জুন ফজলুল হকের আশীর্বাদপুষ্ট আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে পূর্ববাংলায় নতুন সরকার গঠন করেন। এটি ছিল দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। এই মন্ত্রীসভায় কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, আওয়ামী মুসলিম লীগ, পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস যোগ দেয়।[৭৪] এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রতি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সমর্থন আছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পরিষদ অধিবেশন আহবানের দাবি করা হলেও সরকার পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের কোন সভা আহবান করেনি। এই সরকারকে সহযোগিতা ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পাকিস্তান সরকার ফজলুল হককে ৫ মার্চ ১৯৫৬ পূর্ববাংলার গভর্নর করে পাঠান। ফজলুল হকের গভর্নর পদ লাভ ও তার দলের মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি লাভের পেছনে মুসলিম লীগকে দেয়া তার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ছিল। প্রথমত: পাকিস্তান গণপরিষদে পাস করার জন্য যে খসড়া সংবিধান পেশ করা হবে তা তার দল সমর্থন করবে। দ্বিতীয়ত: আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সমর্থন করবে না।[৭৫] অবশ্য পরবর্তীতে ফজলুল হক এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। গভর্নর ফজলুল হক ১৯৫৬ সালের ২২ মে প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহবান করেন কিন্তু সংক্ষিপ্ত নোটিশ দানের কারণে স্পীকার বাজেট বিবেচনা করতে অস্বীকার করেন। ফলে বাজেট পাস করাতে ব্যর্থ হলে অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। পূর্ববাংলায় মন্ত্রিসভা সংবিধান অনুসারে চালানো যাচ্ছেনা এই কারণ দেখিয়ে জরুরি ক্ষমতাবলে কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয়। এক সপ্তাহ পরে কেন্দ্রের শাসন প্রত্যাহার করে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভা পুনর্বহাল করা হয়।

ইতোমধ্যে সরকারের প্রশাসন পরিচালনায় চরম অযোগ্যতা ও ভুল অর্থনৈতিক নীতির কারণে পূর্ববাংলায় খাদ্য পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে। ১৯৫৬ সালের মে মাস নাগাদ সারা পূর্ববাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ এই পরিস্থিতিতে ক্ষুধার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। ৪ আগস্ট ভুখা মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালালে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। প্রশাসন পরিচালনা এবং সার্বিক পরিস্থিতি পরিচালনায় ব্যর্থতার মুখে আবু হোসেন সরকার ৩০ আগস্ট (১৯৫৬) পদত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় গভর্নরের আহবানে আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে ৬ সেপ্টেম্বর যুক্তফ্রন্টের সর্বশেষ সরকার(১১ সদস্য বিশিষ্ট কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা) গঠিত হয়, যা 'আওয়ামী লীগ সরকার' নামে পরিচিত। আওয়ামী লীগ ছাড়াও কংগ্রেস, প্রগ্রেসিভ পার্টি ও তফসিলী ফেডারেশন এই তিনটি হিন্দু দলও এই মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়। এই মন্ত্রীসভায় শিক্ষামন্ত্রী হন আবুল মনসুর আহমদ।[৭৬] শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প বাণিজ্য ও শ্রম দপ্তরের দায়িত্ব লাভ করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগকে বাঙালির জাতীয়তাবাদী মুক্তিআন্দোলনের প্লাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাত্র ৯ মাস মন্ত্রীসভায় থাকার পর তিনি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে দলের জেনারেল সেক্রেটারী পদে থেকে যান, যা ছিল রাজনীতির ইতিহাসে 'এক অনন্য' ঘটনা।[৭৭] এদিকে কেন্দ্রে গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ১২ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক গঠিত রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভায় আবুল মনসুর আহমদকে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[৭৮] মন্ত্রীসভা গঠনকালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উপস্থিত সকলকে বলেন যে, দেশের নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান করাই হবে তার প্রধান কাজ। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে ফরেন এফেয়ার্স পত্রিকায় 'পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা' শীর্ষক এক নিবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, গণতন্ত্রের বিকল্প কোন ব্যবস্থার দ্বারা স্থিতিশীলতা অর্জন বা পাকিস্তানের সংহতি রক্ষণ সম্ভব নয়।[৭৯] কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেই পূর্ববাংলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি ও দুর্ভিক্ষ কঠোর হাতে মোকাবেলা করে। মন্ত্রীসভা গঠনের তিনদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এসে সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে তিন কোটি টাকা সাহায্য বরাদ্দ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সকল মন্ত্রীদেরকে সার্বক্ষনিক কাজ করার নির্দেশ দেন। এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান সারাদেশে ঘুরে মহকুমা ও থানা পর্যায়ে আওয়ামী লীগের কর্মীবাহিনীকে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় নিয়োজিত করেন। শেখ মুজিবুর রহমান যে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মার্কিন দলিলে। ১৯৫৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকাস্থ মার্কিন কন্সাল জেনারেল এল.এস. উইলিয়ামস তার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানান যে, ৭ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাক অফিসে শেখ মুজিবের সাথে দূতাবাসের রির্পোটিং অফিসারের সাক্ষাত হয়। পরস্পর পরিচিত হওয়ার পরই পূর্ববাংলার খাদ্য সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং বলেন যে, আওয়ামী মুসলিম লীগ মনে করেনা যে খাদ্য সমস্যা সমাধানের বিষয়টি খুব সহজ। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে ভারতীয় দূতাবাসের সাথে কথা হয়েছে বলে শেখ মুজিব উল্লেখ করেন। তিনি এই সমস্যার সমাধানে মার্কিন কর্তৃপক্ষের সহায়তা চান।[৮০] খাদ্য পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি ও দুর্ভিক্ষ কাটিয়ে উঠতে বিভিন্ন কর্মসূচি আওয়ামী লীগ শাসনামলে গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগ শাসনামলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়- প্রথমটি পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব পাস, দ্বিতীয়টি গণপরিষদে যুক্ত নির্বাচনের আইন পাস।[৮১] এ ছাড়াও আওয়ামী লীগ শাসনামলে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।[৮২] কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন নেই এই অজুহাতে ইস্কান্দার মীর্জা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগে বাধ্য করেন এবং ১৯৫৭ সালের ১৫ অক্টোবর মুসলিম লীগ নেতা আই আই

চুন্দ্রীগড় নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।[৮৩] ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে বৈদেশিক নীতিসহ কয়েকটি বিষয়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাত দেখা দিলে পূর্ববাংলার আইন পরিষদে আওয়ামী লীগের শক্তি খর্ব হয় এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষত মুসলিম লীগ চক্র ও কে এসপি যৌথভাবে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে ১৯৫৮ সালের ২১ জুন আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ইতোমধ্যে রসরাজ মন্ডলের নেতৃত্বে কয়েকজন সংখ্যালঘু সদস্য কেএসপির সাথে হাত মেলান। এই কোন্দলের অজুহাতে পরিষদে সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও গভর্নর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চে আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করে কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করে। এই দিন রাতেই কেন্দ্রীয় সরকার অনিয়মতান্ত্রিক কার্যকলাপের অভিযোগে ফজলুল হককে গভর্নর পদ থেকে অপসারিত করে চীফ সেক্রেটারী জনাব হামিদ আলীকে গভর্নর নিযুক্ত করে। নতুন গভর্নর আবু হোসেন মন্ত্রীসভা বাতিল করে পুনরায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করে।[৮৪] ১৮ জুন সংসদ অধিবেশন শুরু হলে ন্যাপ সদস্যরা নিরপেক্ষ ভূমিকা নিলে আতাউর রহমান মন্ত্রীসভা আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলে। ১৯ জুন আবু হোসেন সরকার পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হন কিন্তু ২২ জুন আওয়ামী লীগ-ন্যাপ সমঝোতা হলে অনাস্থা ভোটে আবারও ক্ষমতাচ্যুত হন। ২৫ জুন সংবিধানের ১৯৩ ধারা বলে পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন জারি হয় এবং এই নির্দেশ দেয়া হয় যে, প্রদেশে কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সে বিষয়ে গভর্নর কেন্দ্রকে রিপোর্ট করবে।[৮৫] ২২ জুলাই পুনরায় আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯৫৮ সালের ৩০ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হলে ন্যাপ সদস্য মাহবুব আলী স্পীকার আবদুল হামিদের (কৃষক শ্রমিক দলভুক্ত) বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার বিরুদ্ধে অধিকাংশ সদস্যের অনাস্থামূলক মনোভাবের কারণে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী (আওয়ামী লীগের) কার্যভার গ্রহণ করেন। ২১ সেপ্টেম্বর অধিবেশন চলাকালে কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্যরা সামান্য তর্ককে কেন্দ্র করে শাহেদ আলীকে আক্রমণ করলে তিনি মারাত্মক আহত হন এবং ২৬ সেপ্টেম্বর মারা যান।[৮৬] শাহেদ আলীর উপর এই আক্রমণ ছিল কৃষক শ্রমিক পার্টি ও মুসলিম লীগের সম্মিলিত পদক্ষেপ। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করে একটা অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি এবং সামরিক শাসন জারির পথ প্রশস্ত করা। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি ছিল এরই চূড়ান্ত পরিণতি। স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যুকেই ড. শ্যামলী ঘোষ সামরিক শাসন জারির প্রধান কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৮৭] এরপর পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানে সংসদীয় পদ্ধতির অবসান ঘটে।

উপসংহারঃ আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রত্যাশায় বাঙালিরা পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও আস্তে আস্তে তারা বুঝতে পারে যে, ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে এক নতুন উপনিবেশ পাকিস্তানের শাসন শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে পূর্ববাংলা। মুসলিম লীগের সামন্তস্বার্থ ও অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমে ক্ষুব্ধ হয়ে বাঙালিরা সংকল্পবদ্ধ হয় যে, মুসলিম লীগের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে হলে তাদেরকে সংঘবদ্ধ হয়ে এর মোকাবেলা করতে হবে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন বাঙালিদেরকে একত্রিত করে। পূর্ববাংলায় এটি ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচিতে পূর্ববাংলার মানুষের সামগ্রিক দাবিসমূহ তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণের অবসান প্রভৃতি নির্দেশিত হয়েছে। এতে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো উপস্থাপন করা হয় এবং নির্বাচনে ২১-দফার পক্ষে ভোট দিয়ে জনগণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সমর্থন জানান। এই

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার জনমনে পাকিস্তানের মোহমুক্তি ঘটার সাথে সাথে বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবনায় গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় থেকে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অসাম্প্রদায়িক ধারা গড়ে উঠতে থাকে। পূর্ববাংলার সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা, শিক্ষিত শ্রেণীর মননলোকের পরিবর্তন, ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি মৌলিক প্রপঞ্চসমূহকে ধারণ ও আত্মস্থ করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হলেও প্রধানত অভ্যন্তরীণ উপদলীয় কোন্দল, কেন্দ্রীয় সরকারের রোষাণল এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে যুক্তফ্রন্ট পাকিস্তানের রাজনীতিতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। তাছাড়া অগণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করলেও এর বিরুদ্ধে বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। যুক্তফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে বাঙালি রাজনীতিবিদগণ যে ঐক্যের চেতনার স্ফূরণ ঘটিয়েছিলেন তাদের মাধ্যমে সেই ঐক্য অচিরেই বিভেদের যূপকাষ্ঠে বলি হয়। বাঙালি রাজনৈতিক এলিটদের দুই প্রতিনিধি সংগঠন আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টি আর কখনও বাঙালি স্বার্থ ও পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এক বিন্দুতে মিলিত হতে পারেনি। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির কারণে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব চাঙ্গা হয়। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সকল কর্মসূচিতে জনগণ স্বতঃফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। শেখ মুজিবুর রহমানের প্রশ্নাতীত নেতৃত্ব বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে গতিশীল করে। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবর্তনের গতি প্রকৃতির উপর চূড়ান্ত প্রভাব ফেলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

তথ্যসূত্র ও টীকা:

[১] M.B. Nair, *Politics in Bangladesh A Study of Awami League: 1949-58* (New Delhi: Northern Book Centre, 1990), p. 68.

[২] মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*(ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯২), পৃ. ২৭।

[৩] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের* উদ্ভব (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ৭৩।

[৪] উল্লেখ্য যে এই আসনে প্রথমবার ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে উপনির্বাচন হয়। তখন মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে মওলানা ভাসানী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জয়লাভ করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খুররম খান পন্নী (টাঙ্গাইলের জমিদার) নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের নিকট এই মর্মে আবেদন করেন যে টাঙ্গাইলের রিটার্নিং অফিসার অন্যায়ভাবে তাঁর নমিনেশনপত্র বাতিল করেছিলেন। ট্রাইবুনাল এই অভিযোগ গ্রহণ করে নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন এবং নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে ১৯৫৩ সালের মার্চ পর্যন্ত উভয়কে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অযোগ্য ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে পন্নীর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয় এবং ১৯৪৯ এর উপনির্বাচনে তাকে প্রার্থী দেয়া হয়। দেখুন, Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh: Politics and Functioning of the East Bengal Lagislature, 1947-58* (Dacca: University of Dhaka, 1980), pp. 85-88.

[৫] খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ১২২।

[৬] *ইত্তেফাক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩।

[৭] বিস্তারিত দেখুন, মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২), পৃ. ৮২।

[৮] আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪।

[৯] দেখুন, শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৮), পৃ. ২৪৩।

[১০] দেখুন, খোকা রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩।

[১১] মোসা. ছায়িদা আকতার, *আওয়ামী লীগের ভাবাদর্শিক বিকাশ (১৯৪৯-১৯৭২)* (ঢাকা: ফেমাস বুকস্, ২০১৯), পৃ. ২১৩-২১৪।

[১২] দেখুন, আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৫), পৃ. ২৫১।

[১৩] দেখুন, খোকা রায়, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫; আরও দেখুন নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৫৮', প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস*, *১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৫৪; Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh* (Dhaka: UPL, 1986), pp. 118-150.

[১৪] দেখুন, অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫* (ঢাকা: সাঈদ হাসান, তা. বি.), পৃ. ২০০।

[১৫] মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭। আরও দেখুন, অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১-২০৫।

[১৬] ১৯৫৫ সালের পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বার্ষিক রিপোর্ট, দেখুন, আবুল কাশেম (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ: ঐতিহাসিক দলিল*(ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ৬১-৬২।

[১৭] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১।

[১৮] শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫।

[১৯] *ঐ*, পৃ. ২৪৪।

[২০] *ঐ*।

[২১] কামরুদ্দিন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০), পৃ. ৫৭।

[২২] *ঐ*।

[২৩] আশফাক হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশনস্, ২০১৪), পৃ. ২৩৭-২৩৮।

[২৪] মো.মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ১০৫।

[২৫] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১-২৫২।

[২৬] দেখুন, সিরাজ উদদীন আহমদ, *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী* (ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ২২৩। আরও দেখুন, এম আর আখতার মুকুল, *পঞ্চাশ দশকের রাজনীতি ও শেখ মুজিব* (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ২০০১), পৃ. ৫১; *দৈনিক আজাদ*, ৫ ডিসেম্বর ১৯৫৩।

[২৭] ২১ দফা বিস্তারিত দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৩৭৩-৩৭৪।

[২৮] এম আর আখতার মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯।

[২৯] আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৩), পৃ. ২৩২।

[৩০] A. K. Chowdhury, *The Independence of East Bengal* (Dhaka: Jatiya Grantha Kendra, 1984), p. 133.

[৩১] এম আর আখতার মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬৩।

[৩২] A. K. Chowdhury, *op.cit*, p. 139.

[৩৩] আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস* (ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ৮ম মুদ্রণ, ২০২৩), পৃ. ১২৯।

[৩৪] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬।

[৩৫] শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭।

[৩৬] নির্বাচনী ফলাফল সম্পর্কে দেখুন, মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪-১২৫।

[৩৭] দেখুন, কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশের এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী* (ঢাকা: জোবেদা খানম, ১৯৭৯), পৃ. ১৬।

[৩৮] আশফাক হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯।

[৩৯] শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭।

[৪০] বিখ্যাত আলেম মওলানা শামসুল হক (১৮৯৬-১৯৬৯), যিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গওহরডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন।

[৪১] শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯-৫০।

[৪২] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮।

[৪৩] Rangalal Sen, *Op.cit.*, p. 125.

[৪৪] Kamruddin Ahmad, *A Socio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh* (Dhaka: Zahiruddin Mahmud, 4th edition, 1975), pp. 114-115.

[৪৫] *দৈনিক আজাদ*, ১৪ মার্চ ১৯৫৪।

[৪৬] *ঐ*, ১০ মার্চ ১৯৫৪।

[৪৭] *ঐ*, ১১ মার্চ ১৯৫৪।

[৪৮] আরও বিস্তারিত দেখুন, *ঐ*, ২২ মার্চ ১৯৫৪।

[৪৯] Shamsul Huda Harun, *The Making of the Prime Minister H.S. Suhrawardy* (Dhaka: National University, 2001), p. 92.

[৫০] *The Dawn*, 19 March 1954.

[৫১] শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯।

[৫২] *ঐ*।

[৫৩] *দৈনিক আজাদ*, ৪ এপ্রিল ১৯৫৪।

[৫৪] মো.মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩০। আরও দেখুন, অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩।

[৫৫] বিস্তারিত দেখুন,*দৈনিক আজাদ*, ১৬ ও ১৭ মে ১৯৫৪।

[৫৬] *ঐ*, ১৬ মে ১৯৫৪।

[৫৭] *ঐ*।

[৫৮] সাক্ষাৎকারে ফজলুল হক পূর্ব বাংলার অধিক স্বায়ত্তশাসন পাওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু কালাহান লেখেন, ফজলুল হক 'পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান'। ফলে ফজলুল হককে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী 'দেশদ্রোহী' আখ্যায়িত করে। দেখুন, *ঐ*, ২৫ ও ২৬ মে ১৯৫৪।

[৫৯] শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৪।

[৬০] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২।

[৬১] এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৪-২৬৫।

[৬২] দেখুন আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২।

[৬৩] ৯২(ক) ধারা হলো ১৯৩৫ সালের ব্রিটিশ প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের অংশ বিশেষ। এ ধারা বলে কেন্দ্রীয় সরকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বাতিল করে গভর্নরের শাসন বলবৎ করতে পারেন।

[৬৪] *দৈনিক আজাদ*, ৩১ মে ১৯৫৪।

[৬৫] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭।

[৬৬] *ঐ*, পৃ. ২১৯।

[৬৭] কামরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

[৬৮] দেখুন, অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭।

[৬৯] তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪), পৃ. ৫৯।

[৭০] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭।

[৭১] এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭-২৭২।

[৭২] পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান- এই চারটি প্রদেশের পরিবর্তে একটি প্রদেশ।

[৭৩] জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যের কোটা না ধরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০জন প্রতিনিধি নির্বাচন করা।

[৭৪] *দৈনিক আজাদ*, ৭ জুন ১৯৫৫।

[৭৫] Keith Kallard, *Pakistan- A Political Study* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1958), p. 86.

[৭৬] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০৯। মন্ত্রীসভা গঠন প্রসঙ্গে আলোচনা দেখুন, এম আর আখতার মুকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫।

[৭৭] হারুন অর রশিদ, *আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা'র ৫০ বছর* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৬), পৃ. ৭২।

[৭৮] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮।

[৭৯] তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

[৮০] Enayatur Rahim and Joyce L. Rahim (Ed.), *US State Department De-classified Documents 1953-1973, Bangobandhu Sheikh Mujibur Rahman and Struggle for Independence* (Dhaka: Hakkani Publishers, 2013), pp. 68-70.

[৮১] দেখুন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।

[৮২] দেখুন, আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১০৬।

[৮৩] আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৯।

[৮৪] তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭-৮৮।

[৮৫] *ঐ*, পৃ. ৮৮।

[৮৬] অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪-২৯৫।

[৮৭] Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971* (Dhaka: Academic Publishers, 1990), p. 42.